১৬-০৭-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁমশান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- যোগবলের দ্বারাই আত্মার মরচে-জং বেরিয়ে যাবে আর তাতেই পবিত্রতার চমক ফুটে উঠবে। অতএব, যোগের বিষয়ে কখনও অবহেলা কোরো না"

প্রশ্নঃ- বাবা বাচ্চাদেরকে বেহদের আশীর্ব্বাদী-বর্ষা নেওয়ার জন্য কি কি যুক্তি বলেছেন, -যার মধ্যে মায়া চারিদিক থেকে এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ?

উত্তরঃ- বাবা যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, বাচ্চারা তোমরা ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারীরা একই বাবার বাচ্চা, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক। তাই তোমরা কখনও নিজেদের মধ্যে অপরাধ-মূলক কাজ, কুদৃষ্টি বা বিকারী হামলা করতে পারো না। ভাই-বোন তাদের নিজেদের মধ্যে কখনও কোনও বিকারের কার্য্যে যেতে পারে না, - তাই তোমাদেরকে শিববাবার শ্রীমত অনুসারে থেকেই বেহদের আশীর্ব্বাদী-বর্ষা নিতে হবে। অবশ্য মায়াও কিছু কম যায় না। চারিদিক থেকেই সে এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে (বাচ্চারা) তোমরাও তখন ভুলে যাও যে, সম্পর্কে তোমরা ভাই-বোন। আবার সেই একই বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকো, -এটাও তখন ভুলে যাও।

গীতঃ- তুম্হে পাকর হামনে জাঁহা পা লিয়া ..... (তোমাকে যখন পেয়েছি, তবে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই পাওয়া হয়ে গেছে .....)

ওঁমশান্তি। এই গীতের একটা মাত্র অক্ষরই যথেষ্ট। বাচ্চারা তো জানেই, এই বেহদের বাবার থেকেই বেহদের আশীর্ব্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় আর প্রতি কল্পেই তা পাওয়া যায়। বাচ্চারা এটাও জানে যে, প্রতিবারই এই বেহদের আশীর্ব্বাদী বর্ষার পুরোটাই ভারত পেয়ে থাকে এবং তা এরকম নয় যে, নতুন করে তা প্রথমবার পাচ্ছে। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছো যে- বর্তমান সময়ে সেই স্বর্গের আশীর্ব্বাদী বর্ষাসুখ আজ আর নেই- যা রাবণের অভিশাপে তা আজ নরকে পরিণত হয়েছে। অভিশাপের কারণে মনুষ্যরা দুঃখী হয়। আর বরদান অর্থাৎ আশীর্ব্বাদী বর্ষার দ্বারা সুখী হয়। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানে, উঁনি (শিব) হলেন বেহদের নিরাকার বাবা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন বেহদের সাকার বাবা। বেহদের সাকার বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা ছাড়া অন্য কেউই কিন্তু তা হতে পারেন না। যদিও গান্ধিকে বাপুজী (বাবা) বলা হতো, কিন্তু জাগতিক নিয়ম অনুসার সারা মনুষ্য সৃষ্টির তো উনি বাপুজী হতে পারেন না। এরকমেই সমস্ত নিরকারী জগৎ দুনিয়ারই বাপুজী হলেন একমাত্র শিব। তোমরা বাচ্চারা এখন তা জানতে পেরে বলছো - আমরা তো শিববাবার প্রতিই সমর্পিত হয়েছি। শিববাবা স্বয়ং এসে আমাদেরকে ওনার একান্ত আপন করে নিয়েছেন- ওনার আশীর্ব্বাদী বর্ষা দেবার জন্য। আচ্ছ! আমরা মধুবনে আসি কিসের জন্য ? অবশ্যই তা শিববাবার সাথে মিলনের সুখ পাবার জন্য, যদিও জানি উনি নিরাকার। তাই কেবলমাত্র শিববাবা বললে তার পুরো অর্থটা অনেকেই বুঝতে পারবে না, এই কারণেই বলা হয় 'বাপদাদা'। অর্থাৎ শিববাবা আর ব্রহ্মাদাদা। দাদার নাম আলাদা, আর বাবার নাম আলাদা। উঁনি (শিববাবা) নিরাকার,- যিনি সবারই বাবা। এরকমই সবারই দাদা(দাদু)-ও আছেন (ব্রহ্মাবাবা)। সব বাচ্চারাই বাবা-দাদার একত্রিত এই আশীর্ব্বাদী-বর্ষা অবশ্যই তোমরা পেয়ে থাকো। একমাত্র বেহদের বাবার থেকেই সবার এই আশীর্ব্বাদী বর্ষা প্রাপ্ত হয়।

একমাত্র এই বাবাই সবার দুঃখ-হর্তা আর সুখ-কর্তা। তাই তো সত্যযুগে কোন মনুষ্যরেই কোনও প্রকারের দুঃখই আসতে পারে না। আর তাই তো সেই সময়ের নাম হয়েছে - স্বর্গ। আর উনিই হলেন সেই স্বর্গ স্থাপন করার গড ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতা)। এই ভারত দেশই সব থেকে পুরনো। তাই এটাই যা পূর্বে কখনও সব থেকে নতুন ছিল। এখন তা সব থেকে পুরনো হয়েছে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ- পুরোটাই এই ভারতেই ঘটে থাকে। তাই অবশ্যই প্রতিবার এই ভারতেই স্বর্গের স্থাপনা হয়ে থাকে। এখানেই সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতো। এটা কিন্তু তোমাদের জানা আছে। যখনই তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাবে, তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে তা চলে আসবে আর ভাববে যে, এনাদের সেই আশীর্ব্বাদী -বর্ষা কি ভাবে তা প্রাপ্ত হয়েছিল! কি ভাবে এনারা এরকম পূজ্য হয়েছেন! কখন ওনারা রাজত্ব করেছিলেন? আর কার সাহায্যের দ্বারা সেই রাজ্য পেয়েছিলেন? এইসব কিছুই তখন বুদ্ধিতে চলে আসবে। ব্রহ্মাবাবাও আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতেন, দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে মালা দিতে ও প্রদক্ষীণ করতে। যদিও তাদের গুন-কর্ম-কর্তব্যের বিষয়ে বা ওনাদের সম্পর্কের বিষয়ে ওনার কিছুই জানা ছিল না। এখন তো তোমাদের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে তা বুঝতেই পারছো। অবশ্য তা আসে বুদ্ধির ক্রম-অনুসার। তাই তোমরা এখন যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তোমাদের হাঁসিই আসবে। যেহেতু তোমাদের বুদ্ধিতে এটা জানা আছে যে, এরা এই প্রালব্ধ কি করেই বা পেয়েছেন। সঙ্গমযুগেতেই অবশ্য তা পেয়েছিলেন, কারন সঙ্গমযুগেতেই তো পুরনো দুনিয়ার বদল হয়। সঙ্গমেতেই বাবা এসে এই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। আর এটাও জানো যে, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেতে প্রতিবারের মতই, অবশ্যই এই ব্রহ্মা বাবাই তো ছিলেন। ব্রহ্মার দ্বারাই যে বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়। প্রতিবারের মতন, এই লক্ষ্মী-নারায়ণই তাদের আগের জন্মে ব্রহ্মা-সরস্বতী হন। আর ব্রহ্মার সাথে ব্রাহ্মণ- ব্রাহ্মণীরাও অবশ্যই থাকবে। সত্যযুগেই লক্ষ্মী-নারায়ণের সেই রাজধানী ছিল। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার উপস্থিতিও সেই সময়ের অনুসারেই থাকবে। তোমরা এটা তো ভালভাবেই জানো যে তোমরা সে ভাবেই পুরুষার্থ করছো, যারা কল্পপূর্বে যেভাবে পুরুষার্থ করেছিলে। আর তা আমি শুধু সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকি। এক রকমের হয়- রাজ-রাজাদের ঘরানা (বংশ), আর আরেকটা হয় প্রজাদের ঘরানা (বংশ)। তাতেও আবার কেউ অনেক বেশী ধনী হয় আবার কেউ বা যথেষ্ট কম। এরকমই রাজাদের মধ্যেও কেউ অনেক বেশী ধনী আবার কেউ বা কম ধনী হয়। তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে এ সব অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো যে, এনারা এই রাজ্যভোগের সুখ কি করে পেয়েছেন। যা তারা এখন আবার নিজেরাই সেই রাজ্যভাগ্যই নিচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে সেই রাজধানীর স্থাপন হচ্ছে। খুবই সহজ সরল ব্যাপার এটা। অম্বা (মাম্মা) বা কে? -এটাও তো অন্যেরা কেউ জানে না। তাই তোমরাই তা জানাবে, ইনিই হলেন জগৎ-মাতা, -জগদম্বা। কল্পপূর্বেও তারা এই রকম জগৎ-মাতা ও জগৎপিতাই ছিলেন। ওঁনাদেরই বাচ্চা আমরা ছিলাম। সঙ্গমেতেই বাবা আবার আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। জগৎ-মাতার বাচ্চাও-কাচ্চাও তো অনেক থাকে। কিন্তু তাই বলে তো সবাইকেই আর রাজ-ঘরানায় বসানো যাবে না। এখন তো তোমরাই জ্ঞানের সেই ত্রিতীয়-নেত্র পেয়েছো, বাবা যে জ্ঞানের সাগর। তাই নিশ্চয় করেই উনি ওনার বাচ্চাদেরকে জ্ঞানী বানাবেন। যেহেতু ওনাকে না তো মনুষ্য আর না দেবতা বলা যায়- তাই ওনাকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। তোমরা যে কোনো মন্দিরেই যাও সেখানে ওনার এই সব কর্ম-কর্তব্যের কাহিনীও অন্যদেরকে বলতে পারো। রামের ক্ষেত্রেও তোমরা সেভাবেই বোঝাতে পারো। চন্দ্রবংশী ঘরানাও এখনই রচিত হয় যা পরে ত্রেতাতে স্থাপিত হয়। ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপিত হয়। তাই তো ব্রহ্মার নাম এত বিখ্যাত হয়েছে। ব্রহ্মা দ্বারাই বাবা ব্রাহ্মণদের রচনা করান। তোমরা ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হবার জন্যই জানতে পারো যে, -আমরা সবাই একই বাবার বাচ্চারা-

নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্কে এসেছি। তাই আমরা কোনো প্রকারেরই অপরাধ মূলক বিকারী দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে অবশ্যই চলতে পারি না। যেহেতু ভাই-বোনেরা তাদের নিজেদের মধ্যে কোনও প্রকারের বিকারে যেতে পারে না। বাবা স্বয়ং এই যুক্তি রচনা করেছেন- তাই এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারে তুমিও যেমন ব্রহ্মা-কুমার আর আমিও তেমনি ব্রহ্মা-কুমারী। বাস্তবে সারা দুনিয়াটাই কিন্তু বি.কে.। অথচ সবাই তা জানে না। আমরা জানতে পারি, যেহেতু এখন আমরা শিববাবার শ্রীমৎ-এর দ্বারা বেহদের আশীর্ব্বাদী-বর্ষা পাচ্ছি। তবে ওদিকে মায়াও কিছু কম নয়। তাই সে চারিদিক থেকেই বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে আমরা যে নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্কের আর একই বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্ষা নিচ্ছি এটাই ভুলে যাই। অতএব এটাকেই তো প্রথমে ভালো ভাবে বোঝো ! সত্যযুগে তো কেবল মাত্র একটাই ধর্ম থাকে। বাকি সব ধর্মেরই লোপ হয়। তোমরা বাচ্চারা এটাও তো জানো যে, এটা কোন নতুন কথা নয়। প্রত্যেক ৫ হাজার বর্ষ বাদে বাদে এই সৃষ্টি-চক্র ঘুরতে ঘুরতে সেই একই পর্যায়েই ফিরে আসে। যার তিথি, নক্ষত্র, তারিখ পর্যন্ত্য অবিনাশী চিত্রপটে অঙ্কিত অনুসারেই ঘটতে থাকে। আর এটাও তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা দরকার যে, আমরা শিববাবার থেকেই এই যুক্তির বর্ষা পাই। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো পেয়েই গেছি। তাই এবার একমাত্র বাবার স্মরণে থেকে, বাবার থেকে সেই আশীর্ব্বাদী-বর্ষা নেবার প্রয়োজন আছে। স্মরণের দ্বারা অর্থাৎ যোগবলের শক্তি দ্বারাই আত্মাতে সেই চমক আসবে। এতে যেন কোনো ভুল না হয়, এই জন্যই তো তোমরা বাবার মুরলী পেয়ে থাকো। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বুদ্ধিতে পাকা হলে তো যেখানে খুশী যেতে পারো। ধরো কখনও যদি মুরলী নাও পাও, তবুও তোমাদের বুদ্ধিতে তো তা থাকেই -যে আমি তো বাবার প্রতি সমর্পিত হয়েই গেছি। বাবা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে রয়েছে, তাই এখন তোমরা কেবল এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো, তবেই তো তোমরা- এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসতে পারবে। এই মহামন্ত্র একমাত্র বাবা-ই বলতে পারেন যা আর কেউই তা বলতে পারে না। একমাত্র এই বাবাই বলেন, মিষ্টি- মিষ্টি বাচ্চারা, কেবলমাত্র স্মরণের শক্তির দ্বারাই তোমাদের এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সতোপ্রধান হতে পারবে। যদিও এই কথাটাই সবারই জানা আছে, কিন্তু জাগতিক কারোরই বুদ্ধিতে সেভাবে তা আসে না। অবশ্য তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো যে, অবশ্যই কল্পপূর্বে এই বাবা-ই ঠিক এই কথাগুলি বলেছিলেন যে, "দেহ সহিত দেহের সর্ব ধর্মকেই ঝেড়ে ফেলে নিজেকে আত্মা স্বরূপ ভাবো।" সাধারনতঃ আমরা যে সব সংস্কারী জাগতিক আচার ব্যবহার করি, তা সবই তো দেহেরই ধর্ম -তাই না। প্রকৃত অর্থে সবার বাবা একজনই। সকল আত্মারা ঐ এক বাবাকেই স্মরণ করে। খ্রীস্টানদের পোপও সেই একই ভগবানকে স্মরণ করে। আর বলে যে, হে ভগবান দয়া করো। এই মনুষ্যদের ক্রোধী বুদ্ধিকে পাল্টে দাও, তাহলেই এরা আর নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করবে না। কিন্তু, স্মরণ তো সেই একই বাবাকে করবে। যা অন্য আর কাউকেই স্মরণ করে না। এই শিববাবাকেই ডাকে, যাতে উনি এসে পতিতদেরকে পবিত্র পাবন বানায়। আর পবিত্র পাবন হলে পরে তো এই পতিত ছিঃ- ছিঃ রাবনের দুনিয়াতে টিকতেই পারবে না। তাই তাদের জন্য তো অবশ্যই কোনও নতুন দুনিয়া চাই। তাই সেই প্রয়োজনেই কলিযুগ বদলে সত্যযুগ তো হতেই হবে - তাই না ? কিন্তু এই সহজ সত্যটাও কেউ বোঝে না। যেমন, এক ডাক্তার এসেছিলেন- তিনি বলছিলেন এই কলিযুগ তো আরও বহুদিনই কলিযুগই চলবে। বাবা জানান- আরে, পুরো সময়টাই কলিযুগ চলবে কি করে? কলিযুগ কি এতই ভাল নাকি! এরা এসবের কিছু আবার বোঝে নাকি, যা উল্টো-পাল্টা ভাবনা আসে মনে সেটাই আবার অন্যকে গিয়ে বলে। এদের তো জ্ঞানের তীর লাগেই না আর তার বদলে অন্য কেউ এলে তার সেই জ্ঞানের তীর লাগতো। এই জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে

কিছু না কিছু (দালালি) প্রাপ্তিও হয়ে যেতো। ফলে আমার স্বর্গে যাওয়া সহজ হয়ে যেত। বাবার থেকে যদি কেউ এসে অল্প কিছুও শোনে, তাহলেও সে স্বর্গেতে অবশ্যই যাবে। শত হলেও, হেভেনলি গড ফাদাররের (স্বর্গীয় পিতার) কাছে এসে বসেছে তো! বাবা নিজে তা বোঝান, বলেন-"আমি তো সকলেরই বাবা। অনেকেই মানতে চায় না যে, শিববাবা আবার এই ধরাধামে আসবেনই বা কি করে। বাবা উত্তরে জানান- আরে আত্মারা যদি আসতে পারে, তাহলে আমি কেন আসতে পারবো না। আত্মারা যখন এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে, তবে আমি কেন তা পারবো না। এ ছাড়া আমি আসবোই বা কি প্রকারে। তোমরাই আবার ডাকতে থাকো, হে পতিত-পাবন বাবা, তুমি আসো, এসে পতিতদেরকে পবিত্র পাবন বানাও। তখন বাবা বলেন,- আমি আসি এই ভারতেই। প্রতি কল্পের সঙ্গম সময়কালে, এক বারই আসি। তোমরা যখন ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্য পুরো করো, সেই সময়কালে - তখন আমি আসি। তোমাদের বাচ্চাদের এটা এখন নিশ্চয় হয়েছে যে, আবার বাবা এসেছেন আমাদেরকে আশীর্ব্বাদী-বর্ষা দিতে। আর বাবা বলেন- আমার কাজই হলো, পুরনো দুনিয়াকে বদলে দিয়ে তারপরে নতুন দুনিয়া স্থাপন করা। এটাই তো প্রবাদ আছে, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশ। এরপর তোমারাই সেই দুনিয়াকে লালন-পালন করতে থাকবে। সেই আলোর প্রকাশ 'জ্ঞান' তো পেয়েছো। এখন তোমরা কালীকে মন্দিরে দেখলে, তাতে ভাববে যে এটা একটা অসত্য (ভুল) চিত্র। আসলে এই কালীই জগদম্বা। যার এরকম ভয়ানক রুপ আদৌ নয়। বাংলায় কালীর কাছে বলি দেয়, কিন্তু বলির ব্যাপারে কিছুই জানে না তারা। এই জগদম্বার মন্দিরে তো লাখে লাখে ভক্তরা আসে। এমন মনে হয় যেন সব সময়েই সেখানে মেলা চলছে। যদিও সেখানে ছোট একটা মূর্তি রেখে তার নাম রাখা হয়েছে জগৎ অম্বা (মাতা)। কিন্তু, জগদম্বা (মাতা) তো একজনই হওয়া চাই। সিন্ধ প্রদেশে কালীর মন্দির কিভাবে গড়ে উঠেছিলো ? একবার কোনও এক কেল্লাতে ব্যোম্ ফেটেছিল, তখন এক ফকির বললেন - কালীমাতা ভীষণ রেগে গেছেন, -ব্যস, তারপরেই উনি ওখানে গিয়ে কালীর মন্দির বানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এখন, এই কালী কে ? কেউ এসবের উত্তর, তারা কিছুই জানে না। কিন্তু, তোমরা এখন সেই জ্ঞান পেয়েছো, তাই এমন কোনও জিনিষই নেই, যা তোমরা জানো না। তোমরা বুঝতে পেরেছো, বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্ষা বেশী করে পেতে গেলে, পুরোদমে পুরুষার্থ করতে হবে। জাগতিক প্রথম দুঃখের শুরু তখনই হয়, যখন কুমার কুমারীরা বিয়ে -শাদী করে। তোমাদের কিন্তু, বিয়ে করবার শখ বা খেয়ালও কখনও আসা উচিৎ নয়। বাবা যখন বলছেন, বর্তমানের এই রাবণরাজ্য বিনাশের দোরগোড়ায়। এখন যা চলছে তা হলো বিকারী গৃহস্থ ব্যবহার। আগামী দেবী-দেবতাদের উদ্দেশ্যে তা বলা হয়। কিন্তু এটাই সেভাবে কারুর জানা নেই যে, এই আগামী দেবী-দেবতাদের নির্বিকারী বানাবার - কারিগর কে ! যেহেতু, সত্যযুগ হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। কিন্তু শাস্ত্রতে আবার লেখা আছে যে, ওখানেও (সত্যযুগেও) বিকারের প্রচলন ছিল। বাস্তবে কিন্তু সত্যযুগ সম্পূর্ণ রূপেই নির্বিকারী দুনিয়া। যেখানে বিকারী দুনিয়া আর নির্বিকারী দুনিয়াতে কত আকাশ-পাতাল তফাৎ। এই যুক্তিগ্রাহ্য কথাটা সাধারন কারুর বুদ্ধিতেই যে নেই। তোমরা তো জেনেছো, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের যখন রাজ্য ছিল, তখন কত অল্প সংখ্যক মনুষ্য ছিল। তখন মাত্র একটাই ধর্ম ছিল, যা তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টিচক্রেরও পুরো চক্কর লাগাতে (ঘুরতে) হয়, তবেই তো বলতে পারবে, পুরো পৃথিবীতেই চক্কর লাগিয়েছি। সমুদ্রতে তো আর চক্র লাগাতে পারবে না। সত্যযুগেতে কত অল্প সংখ্যক মনুষ্য ছিল, তাই তো কত অল্প জমি ব্যাবহারে নিয়েছিল। এখন মনুষ্য সৃষ্টির হদ এই দুনিয়া পুরো ভর্তি হয়ে আছে। উপরে (শান্তিধামে) যে অল্প সংখ্যক আত্মারা আছে- তারাও এই শেষ সময়ে এখানে আসতে থাকে। ফলে মনুষ্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়েই চলে। যখন

ওখান থেকেও বাকী সব আত্মাদের আসা পুরো সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করবে, আর তখনই আত্মাদের এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। ওঁদের চলবে আসা আর তোমাদের হবে যাওয়া। প্রথমদিকে তো অল্প-অল্প করে আসতে থাকে। যা যুক্তি সহকারে বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার ব্যাপার রয়েছে। আমরাও প্রথম-দিকে গিয়ে ওখানেই থাকব। আমরা যখন সেখানে থাকবো, সেই সময়ে আর অন্য কারও সেখানে থাকা উচিৎ নয়। যদিও এটা বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। তবুও বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন- আচ্ছা, নিজেদের প্রিয় বাবুলকে (বাবাকে) স্মরণ করো। তোমাদেরই তাতে ফায়দা (লাভ) হবে এই বাবাকে স্মরণ করলে। এই জাগতিক দুনিয়ার ইতিহাস- ভূগোল তো মনুষ্যরা অনেকটাই পড়েছে। কত অনেক দূরে-দূরেও যাত্রা করেছে। চাঁদেও গেছে। যা হলো জাগতিক বিজ্ঞানের অহংকার। এই অতির শেষ পরিনতি তিক্ত। চাঁদে তো কিছুই রাখা বা দাঁড় করানোই যায় না। আর তোমরা তো সূর্য-চন্দ্রকেও অনায়াসেই পার করে আরও কত দূরে সহজেই পৌঁছে যাও। সেই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে এখন যথেষ্টই আছে। তোমরা এটাও বোঝো যে, এই অবিনাশী নাটকের খেলা অনুসারে তোমাদেরকে এইসব জ্ঞানের কথা জানান বাবা। বাবা নিজেই তা বলেন, আমিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র পাবন বানাই। আর এটাই আমার কর্ম-কর্তব্যের ভুমিকা। ভক্তিমার্গেতেও আমার যথেষ্ট ভুমিকা আছে। যেহেতু নাটকের চিত্রপট সেভাবেই চিত্রিত। যেরকম তোমরা এই নাটকে অভিনয়কারী, তেমনি আমারও অভিনয় ও কর্ম-কর্তব্য আছে এতে। যা আমার কাজ হলো, তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র পাবন বানানো। আর আমি যা কিছু করি, তারই তো মহিমা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরও তো কত মহিমা আছে। কিন্তু ওনাদের এরকম যোগ্য কে বানিয়েছে। যে এরা সুখধামের মালিক হতে পারে। বর্তমান দুনিয়ায় তো অনেক প্রকারের কতই না দুঃখ রয়েছে। যেমন ধরো, আজকে কেউ মরলো, বা ঝগড়া হলো, যদিও তার কাছে লাখ বা কোটি বা পদম টাকা আছে, কিন্তু যদি কোনও রোগ ইত্যাদি এসে যায়, তখন সে কি করবে! বিরলার মতো ধনীর কাছেও তো কত পয়সা আছে! এক জন্মতেই এত পয়সা যা সহসা দেখা যায় না। কিন্তু তবুও জগতে এরকম কেউই নেই যার কোনও দুঃখই নেই। কোন না কোন প্রকারের দুঃখ তো সকলেরই হয়। এখানকার এই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সব কিছুিই যে মাটিতেই মিশে যাবে। আচ্ছা! মিষ্টি-মিষ্টি হারনিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার আর বাপদাদার স্মরণ-সুমন ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি (ঈশ্বরীয়) বাবা রুহানি (ঈশ্বরীয়) বাচ্চাদেরকে জানায় তার নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) কর্মাতীত অবস্থাকে অর্জন করে আপন ঘরে (শান্তিধামে) ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যাওয়া যাবে তখনই, যখন সেখান থেকে সব আত্মাদের আসা বন্ধ হবে, এর বিস্তারিত ধারনাকে বুদ্ধিতে রেখে এক বাবুলকে (বাবাকে) মনে-প্রাণে ভালবেসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে।

২) জ্ঞানের প্রকাশের আলো পেয়েছি এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েই বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্ষা নিতে হবে। যখন, যেখানেই থাকো না কেন, স্মরণের শক্তির দ্বারা আত্মাকে তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হয়ে, সর্বসিদ্ধি-স্বরূপ ভব(হও)।

দেহ-অভিমান ত্যাগ করা অর্থাৎ দেহী-অভিমানী হতে পারলে বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের, সর্ব শক্তির অনুভব হয়। এই অনুভবই সঙ্গম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য। বিধাতার দ্বারা প্রাপ্ত এই বিধিকে ধারণ করলে যেমন তার বৃদ্ধিও হবে আবার সর্ব সিদ্ধিও প্রাপ্ত হবে। যেখানে দেহ-ধারীর সম্বন্ধ বা স্নেহতে এসে তো নিজের মুকুট, সিংহাসন আর নিজের আসল স্বরূপ সব কিছুই তো ছেড়েই দিয়েছো- সেখানে বাবার স্নেহে এই দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করতে পারবে না ! যেখানে এই একমাত্র ত্যগের দ্বারা সর্ব ভাগ্যের প্রাপ্তি ঘটে।

স্লোগানঃ- ক্রোধমুক্ত হতে চাও তো স্বার্থের বদলে নিঃস্বার্থ হও আর ইচ্ছাগুলির রূপের পরিবর্তন করো।